সেই যে আমার নানা রঙ্গের দিনগুলো

আমার এই নাড়ীর বাঁধন কাট্‌বি কি দিয়ে বল!

মমতা চৌধুরী

মানুষের মন যে কত বিচিত্র! সময়ের প্রচন্ড স্বল্পতায়, ভেতরের বাইরের বিরামহীম চাপেও সে সৃষ্টি করতে পারে অনেক সুন্দর কিছু, আবার অনাবিল বিশ্রামে আলস্য আর স্হবিরতা তাকে পেয়ে বসে 'সিন্ধবাদের বুড়ো'র মত - কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ হতে দেয় না স্বতঃস্ফুর্ত সঞ্চালনে। আমাকেও যে কোন অসাড় দৈত্য পেয়ে বসেছে বুঝিনা - যে অনেকটা সময় ধরে অনঢ় হয়ে বসে আছে আমার সকল ভাব প্রকাশের কাঁধে। আজ চার ঘন্টা একটানা লেকচারের প্রথম ঘন্টা শেষে কফি ব্রেকে যখন দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম জন মার্টিনে 'জন্মদাগ'এ, এক ঝটকায় যেন তা আমার কাঁধের অসাড় দৈত্যটাকে নাড়িয়ে দিল, আর আমার মনের তন্ত্রীর প্রতিটি বুনুনে প্রচন্ড ঝড় উঠল যেখানে বাঁধা আছে আমার জন্মভূমির সাথে নিগাঢ় বাঁধন। পরবর্তি তিন ঘন্টা আমার সামনে ছিল থিয়েটার ভরা শ'কয়েক তরুন মুখচ্ছবি, বিশ্লেষন করেছি Australia's macro policy র নিগূঢ় তত্ব ও তথ্য, অথচ মনটা তোলপাড় করছিল। জন্মভূমির সাথে যে অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা আছি বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে থাকা বাংলার লাখো সন্তান এবং তাদের মৌলিক আধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনার সংবাদে। পৃথিবীর সব দ্বার রুদ্ধ জেনেও মানুষ যুগে যুগে পথ চলে নূতন পথের সন্ধানে কেননা সে জানে আর কোথাও ঠাঁই না হলে সে ফিরতে পারবে মা'র কাছে - মায়ের দ্বার ত তার সন্তানের জন্য অবারিত। জানিনা সংবাদটার সত্যতা কতটুকু, এবং তা কি প্রসঙ্গে প্রস্তাবিত হয়েছে, তবে স্বীকার করছি আমার সব লজিক, বিচার বিশ্লেষন বোধকে ছাপিয়ে, আমার emotional বোধটাই তাড়িত করেছে আমায় তাৎক্ষনিক ভাবে আর সেটাই হয়ত স্বাভাবিক! যারা এই আইন বা নীতি প্রণয়নের প্রস্তাবনা এনেছেন, তাদের হয়ত কোন মহৎ উদ্যেশ্য আছে দেশের কল্যান কামনায়, তবে তাঁদেরকে শুধু এটুকুই বলব প্রবাসে অবস্হানরত বাংলাদেশীরাও বাংলাদেশের সম্পদ। তাদের যেমন অধিকার আছে দেশের উপর, দেশের ও তেমন অধিকার আছে তাদের উপর। কোন আইন প্রণয়ন করে কি তাদেরকে তাদের মৌলিক আধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে? কেননা এ যে আমার অস্বিস্তের প্রশ্ন, এ যে চিন্তা, চেতনা , অনুভবের প্রশ্ন। আমার এই বাঁধন, আমার এই নাড়ীর টান কি ছিন্ন করা যাবে শুধুমাত্র জন্মভূমিতে আমার নাগরিকত্ব কিংবা জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে! পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে প্রবাসে আছি বলে কিংবা দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়নি বলে আমি কি আমার জন্ম পরিচয় থেকে বঞ্চিত হব? আমি কি আর বাংগালি থাকবনা? আমি জানি বহু স্বদেশিকে যারা যে কোন কারণে হয়ত দেশে যেতে পারেন নি পাঁচ বছরের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে, অথচ প্রতিনিয়ত লালন করছে ধারণ করছে বাংলাকে তার হৃদয়ের প্রতি কন্দরে, তার চলন, বলন, জীবন ধারায়। আবার প্রবাসি অনেকেই আছেন যারা প্রতি মূহুর্ত দেশের কোন না কোন বিষয় নিয়ে তিক্ষ্ন সমালোচনায় মুখর হচ্ছেন অথচ বছর শেষে ছুটি হলেই দেশে ছুটে যাচ্ছেন সবার আগে। আমার দেহ কোন মাটিতে মিশে যাবে জানিনা - কিন্তু আমি ত জানি কোন মাটির নিবিড় সুরভি নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি আমি। তিলে তিলে, পলে পলে আমার মননে মানসে ঐ বদ্বীপের রোদ্র ছায়া শ্যামলিমা, হাসি কান্না আনন্দ বেড়ে উঠেছে আমার অস্তিত্বে, বয়ে যায় আমার রক্তের স্রোতধারায়। একটা আইন করে কি করে মুছে দিবে কেউ আমার মরমের সকল মরমীয়া অনুভুতি!

আমার প্রবাস জীবন আমার স্বদেশের জীবনের প্রায় দ্বিগুন। কিশোরীর সরলতা নিয়ে যেদিন প্রদার্পন করেছিলাম এই লাল মাটির দেশে, স্বদেশীদের সংখ্যা সেদিন ছিল হাতে গোনা। খয়েরি রং এর কাউকে

দেখলেই বড় আপন মনে হত। সাদা অষ্ট্রেলিয়ান মহিলার দোকানের দেশীয় মশল্লা বড় অপ্রতুল হলেও তাতেই যেন অকান্ত চেষ্টা করতাম দেশীয় রসনার স্বাদ গন্ধ বর্ণ ফুটিয়ে তুলতে। আমার প্রবাস জীবনের প্রথম অনেক গুলো বছর কতবার যে দেশ থেকে প্রবাসে ফেরার পথে কাশ্মিরি শাল বা জর্জেট কাতানে লেগেছে হলুদের ছোপ বা আচারের তেল। আমি জানি আমার মত আরো অনেকেরই আছে এই অভিজ্ঞতা। তবুও ওই তেলে ঝোলে মাখা বাঙ্গালীত্বই আমায় বাংলার হাসি কান্নার সাথে একই দোলায় দোলাত। দেশের মাটিতে ফেলে আসা মা বাবা ভাই বোনের জন্য যেমন প্রাণ কাঁদত, তেমনি বার বার মন উদাস হত শ্রাবনের অঝোর ধারার অবিরাম বরষনের মুখরতার অনুপস্থিতিতে, অনুভবে হেমন্তের কাঁচা সোনা ধানের ঘ্রানে, শীতের মাঠভরা হলদে সর্ষেক্ষেতের, শরতের দূর্গা পূজা, গ্রীষ্মের কাল বৈশাখি আর বসন্তের আগমনে চঞ্চল হাওয়ায় শিমুল তুলার উড়ে যাওয়া স্মৃতির পিছু পিছু। মৌসুমি ভৌমিকের গানের মত বক্ষ্মপুত্রের তিরে 'আমার বাড়ি ছিল রেললাইনের ধারে' , আর তাই প্রবাসের প্রথম বছর Armidale এ দেশের জন্য মন খারাপ হলেই কখন যে আনমনে হেটে আমি চলে যেতাম ঐ ছোট্ট রেল ষ্টেশনে, ভাবতাম কোন ভোজবাজীতে একটা দয়ালু ট্রেইন যদি আমায় এই প্রশান্ত মহাসাগর পাড় করে নিয়ে যেত আমার মায়ের কোলে! সে দিনকার বন্ধুবান্ধবেরা আজও ওপ্রসঙ্গ তুলে আমায় বিব্রত করে, তবে আমার ঔ যে নাড়ির টান তার বাঁধন কিন্তু কাটেনা কিছুতেই! পরর্বতিতে আরো পাঁচ বছর কানাডার জীবনে একটা বাংলা বই, এক সংখ্যা অনেক পুরানো 'বিচিত্রা'র লোভ দেখিয়ে আমাকে হ্যামিলটনের বংশিবাদকের মত মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারত যে কেউ। বাংলা গানের ক্যাসেট প্রায় আর্টিকের কাছাকাছি দেশটার আটমাস বরফ ঢাকা শীতে আনত প্রাণে উষ- নিঃশ্বাসের ধারা। তাহলে গল্প বলি এক জন 'শরিফ ভাই' এর। যখন উনার সাথে পরিচয় আমাদের কানাডায়, উনি তখন উনার মধ্য চল্লিশ পেরিয়েছেন মাত্র, প্রায় আমার বাবার বয়েসি, তবে তার জন্য আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব হতে একটুও দেরী হয়নি। সপ্তাহের দুটো তিনটা দিন উনি কাজ শেষে সেই ৮০র দশকের প্রথম দিকটায় সংগ্রহ করে আনতের কচুর লতি, শুটকি মাছ, কাকরোল কিংবা পটলের মত দুঃপ্রাপ্য দেশীয় খাবার। কখনও বা উনার শহরের বাড়িতে কিংবা লেক হাউসে আমাদের নিয়ে যেতেন । নিজের হাতের রান্নায় আপ্যায়ন করতেন। হেসে বলতেন, 'আমাদের হাউস ক্লিনারের দৌরত্বে ঘরে কোন দেশীয় মশল্লা রাখা যায় না - অপরিচিত কিছু হলেই তা সে বিনে ফেলে দেয়, আদা বা রসুন যে রান্নার স্বাদকে কত সুস্বাদু করে তুলতে পারে না খেলে তা জানবেই বা কি করে!' সুদর্শন, কর্মক্ষেত্রে নামি দামি অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ শরিফকে প্রথম পরিচয়ে বাঙ্গালী বলে ভুল হতো সেসময়, অথচ কর্তার সাথে উনি যখন অনর্গল চিটাগাঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে যেতেন সাধ্যিকার উনার বাংগালীত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষন করে! ডাঃ শরিফ চট্টগ্রামে জন্মগ্রহন করা একজন বাঙ্গালি। অনেক বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে Manitoba য় আস্তানা গেড়েছেন সেও প্রায় চার দশক। ঘরে প্রচন্ড সুন্দর ব্রিটিস্ সহধর্মিনি রোজমেরী এবং চার সন্তান। অথচ পরিচয়ের প্রথম বছর শরিফভাই বার বার প্রশ্ন করতেন তার প্রিয় চিটাগাং এর অলিগলির কথা! বার বার জানতে চাইতেন আলমাস সিনেমা হলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে তার কথা, এখনও কি কোর্টবিলডিং এর প্রাঙ্গন তেমনি জামজমাট হয়ে উঠে, চেরাগির পাহাড়ের মোড় কি আরো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, বার্মা রাজু হোটেলে কি এখনও পরিবেশিত হয় বড় বড় কই মাছ? জেনারেল হস্পিটাল কি এখনও কর্মব্যস্ত হয় দিনের শুরুতে? তার প্রতিটি প্রশ্নে হৃদয় নিংড়ানো যে আকুলতা থাকত দেশের জন্য, তা প্রমানের জন্য কয়েক বছর পর পর তখনও দেশে যাওয়া হয়ে উঠত না উনার, তা বলে তার এই বাঁধনের বোধ একটুও কৃত্রিম ছিল না। ক'বছর পর একবার উনার ঘনিষ্ট বন্ধু প্রস্তাব দিলেন 'চল শরিফ, দু'জনে আমরা হজ্ব করে আসি', উনি নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, 'আমার কাবা ত আমার মা, আমার জন্মভূমি, আমার প্লিল্গ্রিম ত হবে সেখানেই'। হ্যাঁ, শরিফ ভাই এর পর থেকে প্রায় প্রতি বছর ই দেশে যাচ্ছেন, উনি অতন্র প্রহরির মত উনার মার শিয়রে জেগেছেন তার শেষ ক'টা দিনে। এবছরে শুরুতে

উনার সঙ্গে যখন ঢাকায় দেখা হল, উনি জানালেন উনি ইতিমধ্যে চিটাগং এ উনায় গ্রামের বাড়িতে দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছেন, উনি ভাবছেন বছরের কয়েকটা মাস উনি জন্মভূমির হাজার অরাজকতার মাঝে বেলাশেষে নিজের ছেলেবেলাকে খুজে পেতে।একটুকরো প্রশান্তি খুঁজতে। উনি চান হাতে কলমে উনার চিকিৎসা বিজ্ঞানের আভিজ্ঞতায় কিছু নবীন চিকিৎসকে পারদর্শি করে তুলতে। জননী এবং জন্মভূমির কাছে এভাবেই অনন্ত ঋণের কিছুটা শোধ করার বাসনায়। এক টুকরো আইন করে কার সাধ্য ধ্যান ভঙ্গ করবে আমাদের এই অস্তিত্বের সাধন?

কানাডায় উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করে যখন দেশে ফিরলাম ১৯৮৬তে, লোকে বলত, 'পাগল, কেন ফিরে এলে নিশ্চিত জীবনের সম্ভাবনা ফেলে এই অস্থিরতায়? এ ত অহেতুক দেশকে নিয়ে "hopelessly romaticism" ! মনে মনে বললাম 'জননী জন্মভূমি স্বর্গদপি গরিয়সী'। আবার পথই আমার করল ঘরের বাহির। এবার প্রবাসের পথে তল্পিতল্পা গুটিয়েই। প্রবাসে তল্পিতল্পার বাঁধন যত শক্ত হল, আমার মন তত আনচান করল সোনার খাঁচায় - আমার হৃদয় উড়ে গেল স্বদেশের পানে, আমার হৃদয়ের বাঁধন তত গভীর হলো ঔ সোঁদা মাটি জলে।

আষ্ট্রেলিয়ান নাগরিকত্ব কোন ভাবেই আমার বাঙ্গালীকত্বকে ম্লান করেনি, হরন করেনি আমর জন্মগত বৈশিত্ব- বরঞ্চ তাকে আরো উজ্জ্বল করেছে, গভীর করেছে, আরো অনেক বেশি মূল্যবান করেছে। বাঙ্গালিত্ব আমার প্রবাস জীবনের আর একটা emotional aspect নয়, এটা আমার পুরো সত্বা, মূল্যবোধ, আমার দৈনন্দিন জীবনের রূপরেখাকে নিরূপন করে - আমি যতই না সারাদিন 'একজন আষ্ট্রেলিয়ান ' হয়ে 'মূলধারার আষ্ট্রেলিয়ান'দের সঙ্গে কাটিয়ে আসি। বাংলা আর আমার অসায়ত্ব নয়, বাংলা তার শিকড়ের দাবীতে আমায় অহংকারী করে। আমার বোধকে যেমন আর বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতা, মূল্যবোধ এড়িয়ে যেতে পারে না, বাংলার সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা অহংকার ও আমায় দোলায় তার ভাবের দোলায় প্রতিনিয়ত। তাই ত প্রতি হেমন্তে এই মাবোদের দেশে আমরা উত্তাল হই বোশেখকে বরন করতে। এই যে স্বতঃস্ফুর্ততা, এই যে মিলন মেলা মেলায় মেলায়, এই যে রং এর খেলা নারী পুরুষ শিশু কিশোরের অন্তরে অন্তরে, এও রোধ করার নয়, এত বধ করার নয় একটা কলমের তিক্ষ্ণ আঁচড়ে! ছেলে বলে - 'তোমারাই হয়ত শেষ generation যারা দেশ আর প্রবাসের মাঝে বিভেদ করতে - তা নিয়ে ভাব তাড়িত হতে, হয়ত এই বিভেদ আর বেশিদিন থাকবেনা'। বলি মনে মনে, 'তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাই যেন হয়, তোদের প্রজন্মকে আমাদের মত এমনি করে যেন দিতে না হয় অপার মূল্য ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায়'।

বছরের শুরুতে এবার ছ'মাস দেশে কাটিয়ে ফেরার পর অনেকেই প্রশ্ন করেছেন 'এটতা লম্বা সময় বাংলাদেশে কাটাতে কষ্ট হয়নি?' আমি অবাক হয়েছি এই প্রশ্নে। আমি ত বেশ ছিলাম, জন্মভূমি আমায় লালন করেছে 'দুধে ভাতে'। হ্যাঁ, আমি যেতে পারতাম ইউরোপ আমেরিকার যে কোন দেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই স্বল্পকালীন গবেষনা ছুটিতে, হয়ত এতে আমার কর্মক্ষেত্রে CV একটু বেশী (!) উজ্জ্বল হত, কিন্তু যেমনি করে আমার পথ চলার সব ক্লান্তি মুছিয়ে দিয়েছে আমার মা ও মাটি, তেমনি করে আর কিছু কি শীতল করতে পারতো আমার মনকে! আমার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিশোর তরুন শিক্ষানবিশদের ঔৎসক্য, অবিরাম ট্রাফিক চলাচলের কোলাহল, সব্জি আর মুরগিওয়ালাদের অকান্ত চিৎকার, ট্রাফিক লাইটে সবুজ পরলে দাঁড়ান আর লাল বাতি উপেক্ষা করে ছুটে চলা, তার মাঝেই ভিক্ষিরি, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফুল, চকলেট, ম্যাগাজিন, বা পপ্‌কর্ন ফিরি করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, সেই ঘাম, বৃষ্টি, রোদের সোঁদা গন্ধে ভালই ত কেটে গেছে দিনগুলো, খুব দ্রুতই কেটে গেছে,

কেননা আমার দেশ এখনও আমার আরধ্য ঠিকানা। আর তাইত আমার মার বাড়ির জানালার নীচের কাঠাল গাছের সবুজ পাতায় যখন বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ে, তা আমার পথে পথে চলা তপ্ত কান্ত মনের চোখে আনে পৃথিবীর স্নিগ্ধতম পেলবতায়। বক্ষ্মপূত্রের ওপাড়ের চড়ের ক্ষেতগুলো যখন শর্ষেফুলের হলুদ আঁচলে জড়িয়ে প্রতিক্ষা করে কোজাগরী চাঁদ দেখার, আমার মন আবারো কিশোরীর চপলতায় সময়ের উল্টোরথে ছুটে চলে আমারি মাটির মায়ায়।

আমার বাবার বাড়ির বিরাট আঙ্গিনায়, গ্রীষ্মের ফুলভরা কৃষ-চূড়া গাছটার নীচে ছিল একটা ফলন্ত ডালিম গাছ। জসিমুদ্দিনের ‘কবর’ পড়ে পড়ে আমার সেই কোমল মনেও ঔ ডালিম গাছের ছায়ায় আমার শেষ শয়ানের বাসনা শক্ত হয়ে উঠল। একদিন সাহস করে ভাইদের কাছে তা প্রকাশও করে ফেললাম। ওরা ত হেসেই লুটিপুটি বেশ ক’দিন। ঠাট্টা করতেও পিছপা হলনা এ নিয়ে। বড়ভাই তার সবজান্তা কিশোর গাম্ভীর্যে একদিন বলল, ‘বোকা মেয়ে,শহরের বাড়ীতে এটা করার নিয়ম নাই!’ এর পর ও অনেক বছর এই বাসনাটা তীব্র ছিল, গোপনে লালন করেছি অন্তরের ভিতর, বিশেষ করে প্রবাস জীবনে, যেন শেষ বেলায় ফিরে যেতে পারি আমার বাবামার কোলে, আমার জন্মভূমির চরনধূলায় ধূলো হয়ে। জীবনের বাস্তবতায় বুঝেছি যা আমার নিয়ন্ত্রনের বাইরে তা নিয়ে সাধ্য সাধনা করে, হতাশ না হওয়াই শ্রেয়। তবে আমি জানি আমার এই নশ্বর দেহ যেখানেই মিশে যাক না কেন, আমার আত্মা সেদিন তার শ্বেতশুভ্র আলোর পাখায় ডানা মেলে পাড়ি দিবে ঐ শ্যামল কোমল বদ্বীপের পৌষের তারা ভরা আকাশের পানে। বলত, সাধ্য কার ঠেকাবে আমার অনন্ত যাত্রা আমারি উৎসের পানে, বলত কার সাধ্যি আছে রোধ করাবে আমার এ প্রবেশাধিকার ?

ডাঃ ফরিদ খালেদ শরিফ ও পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাংলার সন্তানদের তরে উৎসর্গ আমার এ লেখা। শুভ নববর্ষ, ১৪১৫।

৯ই এপ্রিল, ২০০৮, সিড্নী, অষ্ট্রেলিয়া।